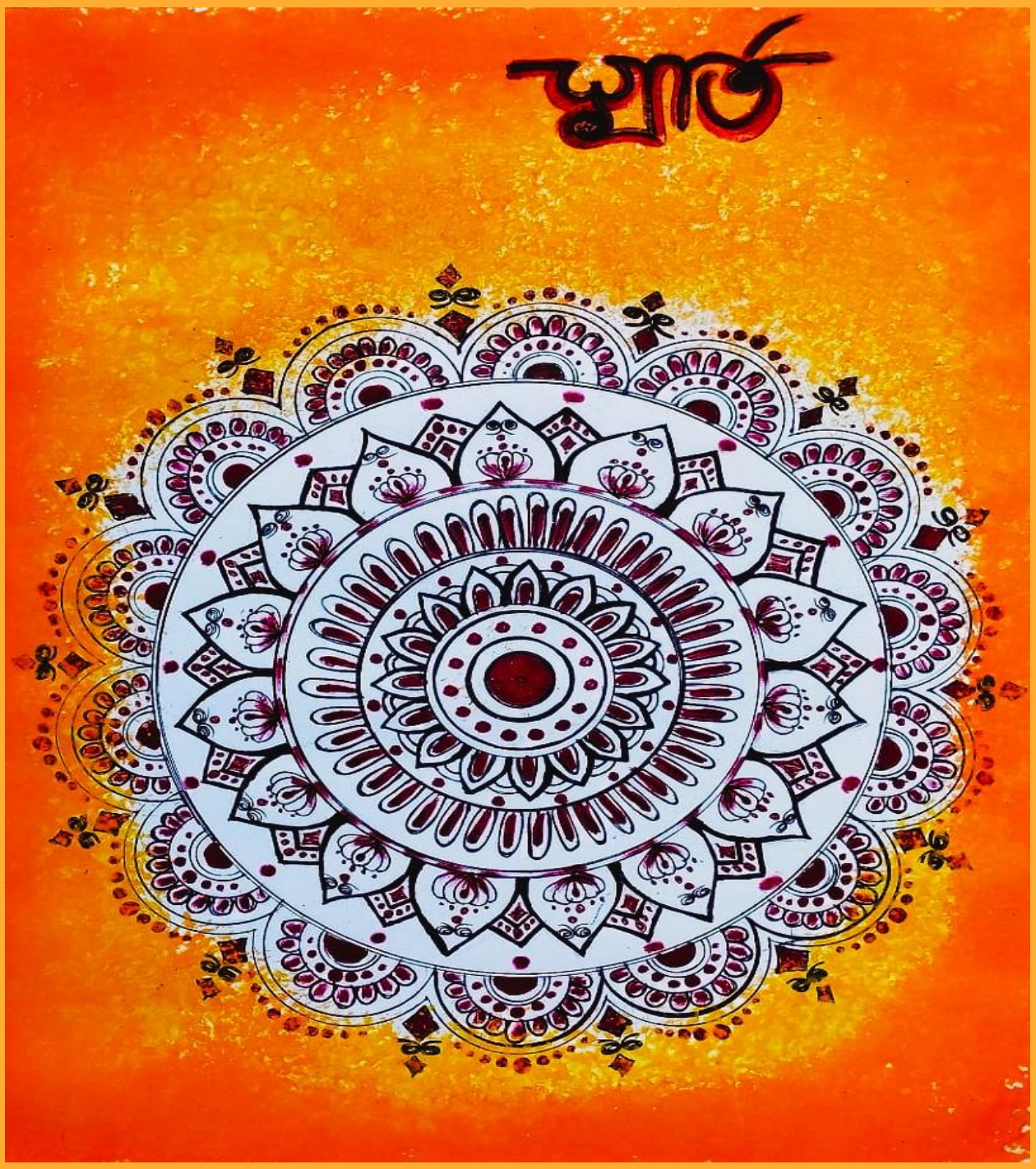

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

দেভোগ, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

স্মার্ত

২০২৪

বাংলা বিভাগ

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

অধ্যাপক হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়

অমিত পাত্র

পলাশ মল্লিক

অমৃতা ঘোষাল (মুখ্য সম্পাদক)

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. পীযূষকান্তি ত্রিপাঠী (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়)

ড. দীপঙ্কর সাধুখাঁ (আই কিউ এ সি কোঅর্ডিনেটর, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়)

সম্পাদকীয়

জীবন তো আর কয়েক টুকরো করুণার সমষ্টি নয়! অজস্র স্বপ্ন আর সংগ্রামের অভিঘাত জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে! তবু মানুষ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভয় পায়। ছুটে চলে সুরক্ষিত চির-আশ্বাসবাহী এক কেন্দ্র আবিষ্কারের তাগিদে! 'স্মার্ত' সেই আবিষ্কারের সামান্য আখর মাত্র...

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. পীযূষকান্তি ত্রিপাঠীকে যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় এই পত্রিকাটির প্রকাশ সম্ভব হল। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আই কিউ এ সি কোঅর্ডিনেটর ড. দীপঙ্কর সাধুখাঁকে, যিনি নিরন্তর আমাদের বিভাগীয় প্রয়াসে সদাহাস্যমুখে পাশে থেকেছেন। বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়ের সুচারু পরিচালনায় এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ধন্যবাদ জানাই বিশেষভাবে অধ্যাপক ড. জয়িতা দত্ত (হুগলী মহসিন কলেজ) ও অধ্যাপক শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরীকে (চন্দননগর সরকারি কলেজ), যাঁদের শুভ কামনা এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রচ্ছদের ছবিটি এঁকে দিয়েছে বিভাগেরই চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্রী বিনীতা মাল।

পরিশেষে একটাই কথা লিখতে ইচ্ছা করছে---

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়

ধন্যবাদান্তে,

অমৃতা ঘোষাল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

সূচিপত্র

আমাদের সেই তাহার নামটি— সুব্রত রায়চৌধুরী

১

অনেক কাল হলো পথ চলেছি...-- জয়িতা দত্ত

৩

কথায় কথায়— হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়

৮

পচা কাকা— দীপঙ্কর সাধুখাঁ

১০

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার স্ববিরোধ ও মধুসূদনের *একেই কি বলে সভ্যতা?*— পলাশ মল্লিক

১২

ভ্যালেনটাইন ডে তে বিষাক্ত *FoMO*-- সৌমি দে

১৪

ফিরে কি পাওয়া যায়? -- সঞ্জীব দাস

১৭

উড়ো চিঠি— রিতু সামন্ত

২১

আমাদের সেই তাহার নামটি

সুব্রত রায়চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়

তোমার মধ্যে তাহার মধ্যে

এবং সবার বুকের মধ্যে

বেধেঁছিলাম ঘর

যে-ঘর ছিল সে-ঘর আছে গতজন্মের পর?

.....

হলদু চিঠির মতো নদী, ‘জলদি আ’ ডাকে বারোমাস

যারা আছে যারা নেই আর যারা অভিজিৎ হবে

সবুজে সবুজ হয়ে সময় এনেছে বয়ে কিছু জুনঘাস

জলের জন্য গিয়ে হাত পাতি ভরসার পান্থপাদপে ।।

ক্লাস ক্লাস হৈ হৈ টিটিবোর্ড পিংপং খেলা

আমাকে বসিয়ে রেখে ছুটি নিয়ে চলে গেলে বেলা

বাড়ি কি যাবেন বলে বিজয়দা-লক্ষ্মীদা-জানাদার ডাক

হিমাদ্রিদার স্বরে মন্ত্রের মতো যেন জ্বলেছে জোনাক

অরুণদা-বাবলুদা-সুকুমারদার কাছে আব্দার করে

ছায়া ঘনিয়েছে দেখি মায়া পড়ে আছে করিডোরে

এত প্রিয়লোকজন কাকে ছেড়ে কার কথা বলি

বুকের গভীর থেকে বন্ধুর মুখ ভেসে আসছে কেবলই

কোথাও কি আছি আমি শুভেন্দু, কৌশিক-প্রবীরেরা আছে?

জয়িতা-সায়ন্তনী-দিলীপ আর দেবাশিস আনাচে কানাচে?

অজস্র ছাত্রেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মনের জানালা

আমারই শিকড় যেন বাহু থেকে গজিয়েছে তার ডালপালা

গাছের ভিতরে গিয়ে গাছ হয়ে বুক পেতে কুঠারকে ডাকি

আমাকে সমিধ কোরো শুকনোর বেশি নেই বাকি ।।

ছবি—বিনীতা মাল, ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

অনেক কাল হলো পথ চলেছি...

জয়িতা দত্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হুগলী মহসিন মহাবিদ্যালয়

অনেক কাল হলো পথ চলেছি জল পেরিয়ে।

ঢেউয়ের মাথায় লঞ্চের দোদুল পালকি চড়ে। যেখানে সূর্য চাঁদের দীঘল বাড়ি। মেঘ তারকার রাজ্যপাট। গঙ্গার অথৈ বুকে ওরা ইচ্ছে খুশি রঙ গুলে দেয়। যেতে আসতে দেখি। কিন্তু বছর আটাশ আগে পেয়েছিলাম অন্য এক পথ। জনহীন জলহীন ধূ ধূ হাইরোড। এখনকার মত সেও কর্মসূত্রেই পাওয়া। দু'পাশে অনন্ত মাঠ । উদোম ফাঁকা জমির পর জমি। ক্ষেতের পর ক্ষেত। দূরে দূরে ছোটখাটো পল্লি। পল্লি ঘিরে ধান পাট খেজুর কলা কাশঝাড়ের আবনান্ত বীথি। আর ঠিক তার মধ্যিখান দিয়ে দিকচক্রবালে উধাও হয়েছে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক। বহু বহু যোজন দূরে সড়কের শেষ মাথায় রানিচক বাস স্ট্যান্ড। পান বিড়ি সিগারেট আর এটা সেটা দোকানপাটের একটু পিছনে তরুণদার বিখ্যাত ভাতের হোটেল। দশ টাকায় সর্ষে পার্সে, বিশ টাকায় মাংস ভাত।

বাসস্ট্যান্ডের খানিক আগে, দু ' তিনশ মিটার হবে, হলদিয়া সরকারি কলেজ। একেবারে হাইরোডের ধারে। ইচ্ছে হলেই সাউথ বেঙ্গল বাস সেখানে হালকা করে স্টপেজ দিতে পারত। সাতসকালে দূরান্ত থেকে আসা দিদিমণি মাষ্টারমশাইদের খানিক সুবিধে হত। কিন্তু না। থামবে না। যেন ইগো ক্ল্যাশ। বরং কলেজ আসবার এক স্টপেজ আগে কাপাসএরা থেকে বাস যেন উড়োজাহাজ। তার সঙ্গে গো গো গর্জন। তপ্ত ইঞ্জিনের তড়পানিতে জানলার কাঁচ সার্শি ঝনঝনিয়ে কাঁদছে। আর লাল সুড়কি ঢালা চত্বরের ধারে গরিমাময় মহাবিদ্যালয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় যাতনায় চেয়ে দেখছে আমাকে। অসহায় দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে পরস্পরে। আমার পূর্বরাগাক্রান্ত কর্ম দিনের শুভারম্ভেই।

কলেজ থেকে রানিচক, আসা যাওয়া সাইকেল ভ্যানে। একরত্তি ভ্যানের চারপাশে পা ঝুলিয়ে জনাদশেক লোক। মধ্যিখানে বোঁচকা বুচকি, হাঁড়ি পাতিল কাচ্চা বাচ্চা। ভ্যানের সিট ধরে টপ করে ভ্যানওলার ঠিক পাশটিতে বসে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত । পতনের ভয় নেই। ভয় যা পাবার তা একবারই পেয়েছি । প্রথম দিনে । কলকাতা থেকে হলদিয়া কলেজে যোগ দিতে আসবার দিনে।

মেচেদা স্টেশনে নেমে নির্ধারিত দক্ষিণবঙ্গের বাস ধরেছি। রাধামনির আগে থেকেই সে বাস দুর্বার গতি নিয়েছে। তার চামড়া ফাটা আসনে কাঁটা হয়ে বসে আছি আমি। সামনের সিটের মরচে পড়া রড ধরে। অনুভব করছি শিরদাঁড়া বেয়ে মৃত্যুর তরল নামছে। আহা, এমন স্বপ্নের চাকরি। রাতদিন বিদ্যা সঙ্গে সহবাসের সুযোগ! যা তা নয়, গভর্মেন্ট সার্ভিস! গুরুজনের মুখে কত আলো! আমার জোয়ান হৃদয়ে উদ্বেল গৌরব! তার মধ্যে গোড়াতেই একি বিপত্তি! উল্টো দিক থেকে তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে ট্রাক বাস ম্যাটাডোর। এই বুঝি ধাক্কা মারলো! এই বুঝি ব্রেকফেল করলো! পরে ক্রমশ নির্ভয় হয়েছি এবং দু একবার এমনও হয়েছে হাইরোডে বাস বন্ধ। বাড়ি ফিরব । কলকাতাগামী আমরা অনেকেই তখন হাত নেড়ে ট্রাক থামিয়েছি। বিরাট উঁচু ট্রাকে আস্তে আস্তে মেয়েরা উঠেছে । বসেছে ড্রাইভার এর আশেপাশে। ছেলেরা চড়েছে পেছনদিকে। বিদ্যার আরাধনা সত্যিই করতাম একশ' ভাগ মনোযোগে । প্রথম প্রথম ক্লাসে যাবার আগে উ উ করে টিচার্স মেসের এক তলায় ৬ নম্বর ঘরে হেঁটে হেঁটে পড়া মুখস্ত চলত । টিচার্স হোস্টেলের ঐ ঘরটাই আমার জন্য ধার্য । একটা চৌকি , একটা টেবিল, দুটো আম কাঠের চেয়ার , কোণের দিকে একটা হিটার, দুটো বালতি, মগ, খান কয়েক বাসনকোসন, দুর্গাচক থেকে কেনা একটা পেল্লাই ট্রাঙ্ক, সেখানে গুছিয়ে রাখা কিছু ফাইল, কিছু জামা কাপড় , আর দেওয়াল ধারে ঠেস দিয়ে রাখা দু 'বস্তা বই খাতা। এই নিয়ে আমার নতুন সংসার। রাত্রি হলে যেখানে বেশিরভাগ দিনই লোডশেডিং হয়। ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে প্রাণঘাতি আরশোলা। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে অবাধে নড়েচড়ে বেড়ায় ধূসর কাঁকড়া বিছে। বাথরুমের ভেতর দিকে খোলা নর্দমার কালো গহ্বর গলে মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় লিকলিকে সাপ। তারই মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে দোতলার বড় বারান্দায় বা সামনের খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে অদূর বসতির মধ্যে মিটমিট আলোয় চোখে পড়ে মহুয়ার ঠেক। মাতাল সুবাস। পুরুষ নারীর মজলিস। সেখান থেকেই আমার ঘরে ঠিকে কাজের জন্য আসত অনিমা । ঢলঢলে মুখের চকচকে কৃষ্ণ রমণী। তেল চুপচুপে খোঁপা টেনে বাঁধা। জানালার বাইরের বড় আকারের মৌচাক ভেঙে খান দুই মৌমাছি আমাকে কামড়ে দিলে সে কোন এক বুনো জরিবুটি দিয়ে মুহূর্তে মৌমাছির দংশন জ্বালা ভুলিয়ে দিয়েছিল। শুনেছিলাম আমার মাতৃকুল নাকি বিখ্যাত বদ্যি বংশ। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার চোখে দেখা সেরা বদ্যি ঐ অনিমা মাঝি। সকাল থেকে দুলে দুলে ক্লাসের প্রস্তুতি নিয়ে ঠিক সময় কলেজে পৌঁছে যাওয়া চাই। ৪৫ মিনিট ধরে তখন এক একটা ক্লাস । চাপা উদ্বেগে দ্রুততর নাড়ির গতি। সামনের সারিতে পরপর মেয়েরা। অষ্টমী সাহু, দিপালি মাইতি , সোমা পাখিরা। ওরা বড় বাধ্য। মাথা নিচু করে শোনে , যা বলি নোট নেয়।

পেছনের দিকে একপাল ছাত্র। বিমল, সানু, উৎপল, বিশ্বজিৎ । তাদের নির্ভয় চোখ, মোটা গোঁফ, গোঁফে হাসি। আমি প্রাণান্ত পড়াচ্ছি । ক্লাস নিচ্ছি একের পর এক। কাউকে বুঝতে দিচ্ছি না এই শিক্ষকতা থেকে আসলে কী চাই। ভেতরে নিঝুম হচ্ছি ক্রমশ। ভাবছি, কখনও কি এমন দিন আসবে যখন পুরো ক্লাস মগ্ন নীরবতায় মিশে যাবে আমার বহির্মুখ ধ্বনি প্রবাহের সঙ্গে! আমার অনর্গল বাক্যপুঞ্জ স্বতঃস্ফূর্ত বোধের মন্দ্রতান হয়ে মুগ্ধ করে দেবে প্রিয় শ্রেণিকক্ষকে!

অনেক শিক্ষকের মধ্যেই তেমন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছিলাম আমার মত করে। কেমিস্ট্রির চিত্তদা যেমন । বিন্দাস মানুষ । মাছ ধরতে ধরতে অথবা ক্রিকেট টিমের কোচ হয়েও কি অনায়াস ছিলেন একজন সেরা টিচার হিসাবে । সোসিওলজির শমিত কর। কঠিন সামাজিক তত্ত্ব তাঁর কাছে জলবৎ সহজ । অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান আজিজুল দা। কোনদিন ইকনোমিক্সের কোনো জটিল সূত্র তাঁর মুখে শুনিনি। দীপ্ত প্রশান্ত মানুষটি বলতেন রবীন্দ্রনাথের কথা । আমার কাছে শুনতে চাইতেন *শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়*। বলতেন , রবীন্দ্রনাথের গানে সুর নয় । শব্দে লুকিয়ে আছে সেই অধরা মাধুরী, অব্যক্ত ইতিহাস, গহন জীবন দর্শন, নিবিড় নিবেদন। গভীরে গিয়ে তার খোঁজ কর। ইংরেজির রাউত দা । মাসে বার তিনেক আসতেন ধূমকেতুর মতো। আর মুহূর্তে পূরণ করে দিতেন সাতাশ দিনের শূন্যস্থান। এমন আরো অনেকে। সিনিয়র জুনিয়র নির্বিশেষে।রিতা দি, শর্বরী দি , বন্দনাদি, প্রথমাদি, সৌম্যশ্রী দি, তপশ্রী দি, মানসী দি, অর্চনা দি, সায়ন্তনী, মহুয়া, শুভ্র, অভিজিৎ , সুব্রত, দেবাশিষ, সামাদ , তপনদা প্রত্যেকে। কেউ কারোর থেকে কম নন, প্রত্যেকে তাঁর তাঁর চিন্তা জগতে বিশিষ্ট । অন্তত আমার দৃষ্টিতে। বিশ্বাসে। আমার একান্ত প্রপঞ্চময় মহা পৃথিবীকে শত স্ববিরোধের মধ্যেও আসলে তাঁরা উত্তরণের কোনো না কোনো নিহিত বীজমন্ত্র উপহার দিয়ে গেছেন। নিজেদের অজান্তেই হয়তো আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন সম্মিলিত মানবতার মৃত্যু মিছিলের মধ্যেও অন্তত একখানি একফালি চাঁদ আবিষ্কারের।

এদের সকলের মধ্যে যাঁকে দেখে আমি সবচেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম তিনি আমার তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান জ্ঞানপ্রকাশ মন্ডল। প্রথম দিন কলেজে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর দেখা মেলেনি। ভারি আগ্রহে প্রধানের খোঁজ করতে গেলে উপস্থিত সকলে মুচকি হেসেছিলেন। শনিবার, যোগদানের দ্বিতীয় দিনে, কলকাতা থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে যথাসময়ে কলেজে উপস্থিত হয়েছি। তিনি এলেন দেড়টা নাগাদ। অচেনা স্টাফ রুমে আমি তখন চুপচাপ। বাকিদের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় পর্ব শুরু হচ্ছে। এক প্রৌঢ় এলেন। মাথায় টাক, জিন্সের প্যান্ট, পায়ে নর্থ স্টার। প্রবেশ করলেন ঝড়ের মতো। ঢুকেই বেসিনের নিচে যথাসাধ্য মাথা ঢুকিয়ে ধুলেন। ব্যাগ থেকে গামছা বার করে ভালো করে মাথা মুছে ছোট্ট চিরুনি দিয়ে পরিপাটি আঁচড়ালেন তার খান পঞ্চাশেক বিপর্যস্ত চুল। তখন আর কোন ব্যস্ততা নেই।

একেবারে নির্লিপ্ত ভাবালেশহীন সন্তোষ। এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ জমালেন যেন কত দিনের পরিচয়। তারপরেই আমাকে অপেক্ষা করতে বলে উধাও । পরে জেনেছি তিনি প্রতি শনিবার দুপুরবেলা এসে ছাত্রদের নিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতে চলে যান। রবিবার সমস্ত দিন পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে সভা করেন। সোমবার এক বেলা পরপর তিন চারটে ক্লাস নিয়ে নিজের সুদূর কোনো ঠিকানায় ফিরে যান। এই তাঁর সরকারি রুটিন। এ নিয়ে কলেজের ঘরে বাইরে কোন বিরোধ কোনদিন বাঁধেনি। জেনেছি, তাঁর নিজস্ব একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে । লুমিজেন প্রকাশন। সেখান থেকে বাংলা কম, অন্যান্য বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা বই বেরোয়। বেশিরভাগই বিজ্ঞান বিষয়ক। লেখক মূলত তিনি এবং তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ দু 'একজন পন্ডিত বন্ধু। এই সমস্ত মানুষগুলো তাঁদের নিজস্ব যাপন ছন্দে, নিজেদের উড়াল ভঙ্গিমায় আমার কর্ম জীবনের গোড়ায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শিক্ষকতার সার্থকতা বাঁধানো বইতে কেবল নেই । মর্মের লুকোনো সিন্দুকে সেই বর্ণনাতীত মহাজ্ঞান, রহস্যময় পরা অপরা অমৃতপুঞ্জ আত্মবিলাসে মত্ত। আমি আজীবন তাঁকে হয়রান হয়ে খুঁজে চলেছি। চাবি পাচ্ছি না।

তারপর দিন কেটেছে ক্যালেন্ডারে। দেখতে দেখতে সরে গেছে অনেকগুলো বছর। নতুন সম্পর্ক পুরনো হয়েছে। যত পুরনো তত জমাট। সহযাত্রী শিক্ষকেরাই নন নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে। কলেজ অফিসের সঙ্গেও। জানাদা , পার্থদা, সুকুমার দা , বাবলুদারা সবাই যেন আত্মজন। স্টাফ রুমের বড় টেবিলের চার ধারে তখন আমরা সারাদিন হইহই করি। বাড়ি ফেরার নাম নেই। জলসা বসাই। এখানে ওখানে নৃত্য গীতি আলেখ্য পরিবেশন করতে যাই দল পাকিয়ে। আমাদের সংস্কৃতিক দলের নাম দেওয়া হলো জৈত্রী সংঘ। সৌম্যশ্রী দি র দেওয়া নাম। ইতিমধ্যে আমাকেই নিতে হয়েছে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব। যদিও আমরা সবাই রাজা। প্রায় সমবয়সী চারজন। শুধু যোগদানের তিথি নক্ষত্র বিচার করে আমি কিঞ্চিৎ এগিয়ে ছিলাম। সিঁড়ি, বারান্দা, লাইব্রেরি , ক্যান্টিন, ছাত্র আন্দোলন, অধ্যক্ষ ঘেরাও এ সবই আমার নিজস্ব ভুবনে স্বাধিকারপ্রমত্ত দখল নিয়েছে। বিশেষ করে ঘেরাওয়ের দিনগুলো। মেন কোলাপসিবল এ তালা পড়েছে । উত্তাল ছাত্ররা গেটের বাইরে ঢাক পেটাচ্ছে। প্রিন্সিপালের বন্ধ দরজা, ভেতরে আমরা দল দল শিক্ষক, জোটবদ্ধ কমরেডের মত প্রতিবাদের ভাষায় প্রতিরোধের আগুন জ্বালছি। তবে কেবলই নিজেদের মধ্যে।ঘেরাও দিনে অধ্যক্ষের সামনে পর পর চেয়ারে জরুরী কথা বিনিময় করতেন গম্ভীর অভিজ্ঞ মাস্টারমশাইরা। আর আমরা থাকতাম পেছনদিকে। ছাত্র রাজনীতির হাজার দুর্ঘটের মধ্যে অপরিণামদর্শী বাচালের মত মনের আনন্দে হাসাহাসি করতাম। সঙ্গে ছিল জ্যোতিষ চর্চা । কবিতা লিখে কার্টুন এঁকে লোক জমানো। এরই মধ্যে একবার সহসা একজন মাতব্বর গোছের ছাত্রনেতা দরজা খুলে আমাদের দু' একজনকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। বাকিদের সপ্রশ্ন চোখের সামনে দিয়ে আমরা পায়ে পায়ে

বেরোই। ছাত্রটি বলে, ম্যাডাম একটু বাইরে আসুন, শুনুন, আপনাদের বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমরা তালা খুলে দিচ্ছি আপনারা বাড়ি চলে যান। স্যারেরা থাকুন।

আটবছর পর হলদিয়া ছাড়বার দিনে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম এক গাড়ি সামগ্রী। অফুরান স্মৃতি জড়ানো কত বন্ধুতা, কত বই, উপহার, মিষ্টির বাক্স, ফুলের বোকে। আর তার মধ্যে নগন্য একটি পেন, একটি ফুল, একখানি কার্ড। স্টাফ রুমের পর্দা সংকোচে সরিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো পা এক ছাত্র, ভারি কুণ্ঠায় রঙিন কাগজ মুড়ে আমার কাছে রেখে গেছিল তার অনির্বাণ শ্রদ্ধা। ভাগচাষীর ঘরের সেই ছেলে আজ দিল্লির কোনো একটি কলেজের অধ্যাপক।

ছবি–উদয় প্রামাণিক, ছাত্র, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

কথায় কথায়

হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

কেবলই কথা? কথা তো থামাতেও হয় কখনো কখনো। বাণীর বরপুত্রকেও তো লিখতে হয়েছিলো একদিন-- *কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি, /এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি/ যত উর্ধ্বে তোলো তারে তার চেয়ে আরো উর্ধ্বে ধায়/গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা.....*

স্তব্ধতার কথা বোধহয় ইদানীং ভুলে গেছি আমরা। ভুলে গেছি কার্লাইল বলেছিলেন একদিন- *Speech is silver, but silence is golden,* আসলে বড় বেশি কথা বলি আমরা ইদানীং-- জীবনে, মৃত্যুতে, প্রেমে, অপ্রেমে, সম্ভোগে, ছিন্নতায়, মিলনে, বিরহে, বিষাদে, সাম্প্রতিক প্রতিটি তপ্ত ঘটনার অব্যবহিত অভিঘাতে আর উত্তেজনায়। কোথায় পৌঁছয় সেই সব অজস্র কথার বন্যা প্রতিদিন? আদৌ পৌঁছয় কি কোথাও? *মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং?*

সকলেই জানেন, এই নামে একটি নাটক আছে শেক্সপিয়রের। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে একটি সংলাপ আছে ডন পেড্রোর - *Speak low if you speak love.* ইদানীং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে পূর্বরাগ থেকে বিরহ পর্যন্ত এতটাই সাড়ম্বরে ও সোচ্চারে উদযাপিত হয়, শেক্সপিয়র এবং পেড্রো জীবিত থাকলে সম্ভবত বড় কুণ্ঠা বোধ করতেন। আসলে নিভৃত পরিসর বলে কিছু নেই আর কোথাও, সবটাই উন্মুক্ত, ঘোষিত, উচ্চকিত এবং প্রচারিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-- *প্রাণের সঙ্গে যখন কোনো কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারই একটা বল থাকে-- যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয় ...*

এত বিস্তর কথা, চেঁচিয়ে কথা শুনে আজকাল তাই মনে হয় এইসব কথা, সম্পর্ক অথবা সম্পর্কছেদের মধ্যে আসলে যা আছে তা কেবলই চাপল্য অথবা অস্থিরচিত্ততা, কোথাও আসলে প্রাণ নেই কোনো, গভীরতা নেই, সত্য নেই--*কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি—/তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।*

চেঁচিয়ে বলা নামে একটি প্রবন্ধ আছে রবীন্দ্রনাথের। এই প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছিলেন তিনি—

আজকাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চেঁচিয়ে দান করে, চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়, এমন-কি, গোল থামাইতে গোল করে...

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে এই বিস্তর কথা বলা আর চেঁচিয়ে বলার অভ্যেস যে কতদূর পর্যন্ত অভদ্রতা, অসভ্যতা, কদর্য গালিগালাজ এবং নির্হেতু বিদ্বেষ আর কুৎসায় পর্যবসিত হতে পারে, বিভিন্ন গ্রুপগুলির কল্যাণে আজকাল তাও বোধহয় অজানা নেই কারো।

অন্ধের স্পর্শের মতো নামে একটি বই লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। এই বইটিতে তিনি স্মরণ করেছেন *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের নিখিলেশের কথা, চন্দ্রনাথবাবুর কথা আর *ফাল্গুনী* নাটকের অন্ধ বাউলের কথা। কম কথা অথবা নীরবতার সামর্থ্যকে যাঁরা অতিকথনের চেয়ে বহুগুণ বেশি বাঙ্ময় করে তুলতে পেরেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের চমস্কির কথাও, চার সিলেবলের শব্দ শুনলে যিনি এখনো ভেবে দেখতে চান, তাকে কোনোভাবে এক সিলেবলের শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা।

কম কথা বলার অভ্যেস ভালো। এতে অস্মিতা কমে, চারপাশের পৃথিবীকে আরো একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করা যায়। আরো ভালো মাঝে মাঝে নিঃশব্দ থাকা। স্তব্ধতা কখনো কখনো হিরন্ময়। এই তো সেদিন, এক হেমন্ত সন্ধ্যায় এক নিকটজন হঠাৎ-ই বললেন আমায়, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে আমার কথা প্রায়শই মনে পড়ে তাঁর, মনে হয় এ গান যদি তিনি আমাকে শোনাতে পারতেন...

এতটাই অভিভূত হয়েছিলাম আমি, কথা বলতে পারি নি আর, স্তব্ধ থেকে দ্রুত চলে গেলাম ভিন্ন প্রসঙ্গে। হয়তো ক্ষুব্ধ হলেন তিনি, ঈষৎ আহতও। কিন্তু না-বলা বাণীর ঘন যামিনীতে, কারো ভাবনা যদি নক্ষত্রের মতো জেগেও থাকে কোথাও, সে কথা কি আমি আদৌ শোরগোল করে তাঁকে বলতে পারতুম সেদিন?

ডন পেড্রো হয়তো আমাদের জীবনে এভাবেই ফিরে আসেন বারবার।

Speak low if you speak Love.

পচা কাকা

দীপঙ্কর সাধুখাঁ, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

আমাদের পচাকাকা, পাঁচ ফুট উচ্চতার তামাটে বর্ণের পেটানো চেহারার একজন মানুষ।কাকার পোশাক বলতে খালি গায়ে কাঁধে গামছা আর গুটিয়ে ভাঁজ করে হাঁটুর উপরে পরা লুঙ্গি। ছোটবেলা থেকে এই কাকাই আমাদের হিরো। সকালে পচা বলে ডাকলেও একটু বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম কাকার ভালো নাম সোমনাথ। কাকার বাড়ি টা আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে।

ছোট থেকেই দেখতাম কাকা ছিলো আমাদের মুশকিল আসান। নদীতে আমাদের সবাই কে নিয়ে স্নান করতে যাওয়া, বাড়ির সব বাচ্ছাদের নিয়ে মেলায় যাওয়া, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া পাখির সদ্য ডিম্ ফোটা বাচ্ছা দের আবার নারকেল গাছের উপরে চড়ে বাসায় মা পাখিটার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া, ডাঙার উঁচু গাছে উঠে আম-জাম-জামরুল-আমড়া-বাতাবি লেবু-সপেদা ইত্যাদি পেরে আনা, আবার গাছে উঠে আটকে থাকা ঘুড়ি পেরে নিয়ে আসা সব কিছুতেই আমাদের ভরসা ছিল কাকা। এছাড়া বাড়ির যেকোনো কাজ ই হোকনা কেন, ঠাকুমা শুধু বলত, *একবার পচা কে ডেকে আনতো,* আর তার পর আমরা সব ভাই মিলে চলতাম কাকার খোঁজে। বেশির ভাগ সময়েই কাকার আস্তানা ছিল ল্যাডলো জুট মিল মাঠের গাছতলা। আসলে কাকা ছিল ওই চটকলের কর্মী। কাঁচা আনাজ খেতে খুব ভালোবাসতো, তাই কাকা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা ভাইরা মিলে হাতের কাছে কুমড়ো, বেগুন, পটল যা সবজি থাকতো তাই দিয়ে বলতাম কাকা এটা খেয়ে দেখাও, আর কাকাও সাথে সাথে খেয়ে নিতো। তারপর মাকে বলতো চা দিতে। এই ভাবে মরা পোড়ানো থেকে- বিয়ে বাড়ির জোগাড় সব কিছুতেই কাকাকে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলাম। ক্লাস ফাইভে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে যখন লালু পড়তাম তখন আমার কল্পনাতে কাকার কথাই মনে হত।

এভাবে চলতে চলতে বড় হয়ে একটা হাইস্কুলে চাকরি পেয়ে গেলাম তার বেশ কিছু বছর পর ২০০৮ সালের মাঝা-মাঝি কাকা বাড়িতে এসে বলতো রাতে মাঝে মধ্যেই বুকে ব্যাথা হচ্ছে আর উঠে বসে থাকতে হচ্ছে, আমি বলেছিলাম-- *ভালো করে ডাক্তার দেখাচ্ছ ?* । উত্তরে কাকা বলত *হ্যাঁ, ই. এস. আই. তে দেখাচ্ছি*। তারপর আগস্ট মাসের একদিন সকালে আমি ঠিক স্কুলে

বেরোব, দেখি কাকা এসেছে বাড়িতে। মা, চা খেতে দিয়েছে, আমি বললাম --*কেমন আছো? কাকা বলেছিল ভালো*।

তারপর বেলা প্রায় তিনটে হবে আমি তখন স্কুলে, বাড়ি থেকে ফোন, আমার মেজো ভাই ফোনের ওপার থেকে বললো-- *পচাকাকা মোরে গেছে।* শুনে আমার চোখ থেকে জল এসে গিয়েছিলো, জিজ্ঞেস করেছিলাম-- *কখন...? কোথায়...?* ভাই বলেছিলো --*সাড়ে বারোটা - একটা হবে, ফুলেশ্বর স্টেশন রোডে হার্ট এট্যাক হয়েছিল, তারপর পুলিশ নিয়ে গিয়ে উলুবেড়িয়া হাসপাতালের মর্গে রেখেছে*। এর পর আমি ভারাক্রান্ত মনে তাড়াতাড়ি মোটরসাইকেল বাগনান থেকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালের মর্গে পৌঁছে ভিতরে ঢুকে দেখলাম অনেক গুলো বিকৃত লাশের সাথে রক্ত আর দেহরসে ভেজা মেঝেতে পরে আছে কাকার দেহটাও। সেই খালি গা, লুঙ্গি পরা গামছা টা আর ছিলনা। ক্ষীণ আলোয় মর্গের সেই দৃশ্য আর বিদঘুটে একটা মানুষ পচা গন্ধ আজও আমায় খুব কষ্ট দেয়। তখন কে যেন বলেছিলো-- *আজ রাতে আর পোস্টমর্টেম হবেনা, আপনারা চাইলে বরফ কিনে বডি চাপা দিয়ে রাখতে পারেন, কাল নাহলে বডি পচতে শুরু করবে*। তারপর বরফকল থেকে অনেকটা বরফ আর কাঠ চেরাই কল থেকে কাঠ গুঁড়ো এনে আবার সেই মর্গে প্রায় দম বন্ধ করে ঢুকে বরফ চাপা দিয়েছিলাম মাছের মতো তার উপর ছড়িয়ে দিয়ে ছিলাম কাঠের গুঁড়ো।

পরদিন সকালে ডোমেরা কাকাকে নিয়ে গেলো লাশ কাটা ঘরে আমরা বাইরে অপেক্ষায় রইলাম। অনেকটা পরে সাদা কাপড়ে মুড়ে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিলো। বিভিন্ন জায়গায় সই -স্বাক্ষরের পর কাকাকে নিয়ে ফিরলাম বাড়িতে। চারিদিকে কান্নার রোল, কাকার আট বছরের ছোট ছেলেটা কাকাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো--*বাবা তুমি পরের জন্মে আবার আমার বাবা হোয়ো* । এই কথার পর কান্নার শব্দ আরো বেড়ে গিয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য। সেই পড়ন্ত বিকেলে এরপর কাকাকে নিয়ে চললাম শ্মশানের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আট বছরের ছেলের হাতের মুখাগ্নিতে জ্বলে উঠলো চিতা। একটু পরেই পোস্টমর্টেম করা কাটা দেহের সেলাই খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ভিতরের সব অঙ্গ। ঘন্টা তিনেকেই চিতা নিভে ছাই হয়ে গেল। আর আমাদের ছোটবেলার সেই গ্রাম্য হিরো দুদিনের মধ্যেই রক্ত মাংসের দলা পাকিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার স্ববিরোধ ও মধুসূদনের

একেই কি বলে সভ্যতা?

পলাশ মল্লিক, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

উনিশ শতক বাঙালির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে জাগরণের, পরিবর্তনের শতক, দীর্ঘকাল লালিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তির মাথা তুলে দাঁড়ানোর শতক।জগদ্দল কালাপাহাড়-সদৃশ যা কিছু ভাবনা-চিন্তা পরাগতির লক্ষণাক্রান্ত, সেই লক্ষণকে উৎপাটিত করার শপথ নিয়েই যেন উনিশ শতকের আগমন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলমান মোঘল শাসনের অবসান আর খ্রিস্টান ইংরেজের আবির্ভাবের সেই ক্রান্তিকালে প্রচলিত কিছু অমানবিক অস্বস্তিকর রীতিনীতি দূর নতুন এক আধুনিক সমাজ গড়ার স্বপ্নকে রেনেসাঁ বলা হবে কিনা বা তা ইউরোপের নবজাগরণের কতটা সমীপবর্তী বা আদৌ তুলনীয় কিনা সে সম্পর্কে বিবাদ, বিতর্ক এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসেও প্রাসঙ্গিক।তবুও এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ বা নতুন যুগ যাই বলা হোক না কেন,সেই যুগের ভগীরথ ছিল ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষা। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রথমে কোম্পানির শাসনে এবং তারপর মহারানীর নামাঙ্কিত সরাসরি ইংরেজ সরকারের শাসনে ইংরেজি শিক্ষা-উন্মুখ বাঙালিকে নতুন মত ও পথের সন্ধান দিয়েছিল,দিয়েছিল মুক্তির আস্বাদ।একদিকে রাজা রামমোহন রায়,দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো এ-দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ অন্যদিকে ডেভিড হেয়ার,ড্রিংক ওয়াটার বেথুন,আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ বিদেশি হিতৈষীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।প্রথমে শ্রীরামপুর ও পরে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেশীয় শিক্ষার অবকাশ তৈরির প্রচেষ্টার পর ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতে পাশ্চাত্য বা ইংরেজি শিক্ষার যথার্থ জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকরুপে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন এবং ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্রদের মধ্যে মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে পদচ্যুত হন।কিন্তু এই মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যেই যে ঝড় তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তুলে গেলেন,তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।একজনমাত্র শিক্ষককে আবর্তন করে, তাও মাও তিন বছরের মধ্যে সামগ্রিক সমাজ পরিবর্তনের এই নজির সারা বিশ্ব ইতিহাসেই হাতে গোনা। ডিরোজিওর শিষ্য, যাঁরা পরিচিত

হয়েছিলেন ইয়ংবেঙ্গল নামে, তাঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এই শতকের বাকি সময়ের অনেকটা। সংস্কারমুক্ত দেশ গড়তে এই নব্যবঙ্গদের প্রগতিশীল ভূমিকার পাশাপাশি সমানভাবে চর্চিত হয়েছে,নিন্দিত হয়েছে এই ডিরোজিও পন্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা,স্বজাতিবিদ্বেষ এবং অতি অবশ্যই তীব্র সুরাসক্তি। সমকালীন রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তা যেমন মূর্ত হয়েছে, তেমনি মধুসূদনের মতো নব শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রকৃত অর্থেই নব্যবঙ্গীয়ের রচিত প্রথম প্রহসনের বিষয়বস্তু হতেও তার বাধেনি। মেকলে কথিত ফিলট্রেশন নীতির মধ্যে যে ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা ছিল, ইংরেজি লিবেরাল শিক্ষার মধ্যে যে স্ববিরোধ ছিল, দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতি-অনুশাসন থেকে নব শিক্ষিতদের যে ব্যবধান ছিল – তাই *একেই কি বলে সভ্যতা?* র নবকুমার,কালীনাথ-দের মত চরিত্রদের তৈরি করেছে।

একেই কি বলে সভ্যতা?– প্রহসনে মধুসূদন আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত কলেজ পড়ুয়া যুব সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার,ভোগবিলাসী জীবন-যাপন,মদ্যপানাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতার বিকৃত রূপ এবং তাদের কাপট্যকেই বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।যে শিক্ষা বাঙালির যাত্রাপথকে উন্নত,আধুনিক করে তুলতে পারে, সেই শিক্ষাই এক শ্রেণির যুবক সম্প্রদায়ের অপব্যবহারের ফলে তার কদর্য রূপ নিয়ে বিদ্রুপে,কটাক্ষে উঠে এলো প্রহসনটিতে। যে নব সমাজের স্বপ্ন সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা-রা দেখেছিলেন তার প্রধান দুই স্তম্ভই ছিল অন্তরে যুক্তি,চিন্তার স্বচ্ছতা ও সততা। কিন্তু নববাবু, কালী বাবুদের আচরণে প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের বহিরঙ্গের চাকচিক্য আর কপটতা।সুরাপান, বেশ্যাসক্তি, খেমটা নাচের আসর নতুন কিছু নয়, বরং বাবু সমাজের অনেক বিবরণেই তা উল্লিখিত। কিন্তু মধুসূদন বিরোধের জায়গাটা স্পষ্ট করে তুললেন জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার আলোচনাকে গণিকাপল্লিতে স্থানান্তরিত করে। এক শ্রেণির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধঃপতিত রূপটাকে নতুন আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করালেন তিনি। নতুন প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র একমুখী আধুনিকতাই আনলো না, তার মধ্যেকার স্ববিরোধকেও প্রত্যক্ষ করালো তৎকালীন সময় আর অনাগত ভবিষ্যতের কাছে।

ছবি–উদয় প্রামাণিক, ছাত্র, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

ভ্যালেনটাইন ডে তে বিষাক্ত *FoMO*

ড: সৌমি দে, সহকারী অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য আজকাল বেশ কিছু *westernized abbreviation* এই চল্লিশ ছুঁই এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শিখতে পারছি। সেগুলোর মধ্যে FoMO শব্দটি আজকাল নেট দুনিয়ায় ভীষণ ভাইরাল একটি স্ল্যাং। আজ একটু এই বিষয়ে নয় কথা বলি। অনেক সময় কিছু সোসিয়াল মিডিয়ার দেওয়ালে কমেন্ট বক্স এ লিখতে দেখেছি *Don't get FoMO* !. বস্তুত এই *FoMO* টা তাহলে কি? *Fear of Missing Out* অর্থাৎ কিছু অনুপস্থিতির ভয় বা হাতছাড়া হবার ভয়। আসলে এটি একটি আবেগ বা মানসিক অবস্থা। ২০০৪ সাল থেকেই এটির ব্যাবহার নেটওয়ার্কিং সাইটে দেখা যায় (WJCC, 2021)। যথেচ্ছ ভাবে সোসিয়াল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারের জন্যই বর্তমান প্রজন্ম মূলত *FoMO* উপলব্ধি করে থাকছে (Alutaybi, 2020; Laurence, 2023)। এটি এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেখানে অনুভূত হয় - *আমি* ছাড়া বাকি আমার আশপাশের অন্য সব মানুষ জন আরো ভালো, আরো সন্তোষজনক জীবন অতিবাহিত করছে এবং যেটা আমার জীবনে মিসিং বা অনুপস্থিত। আমাকে এইসমস্ত পেতে হবে নাহলে আমার সোশাল কানেকশন গুলোতে *আমি* পিছিয়ে থাকবো।

বর্তমানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কইন সাইটের দৌলতে যেটা আমরা দেখে থাকি একটা *pseudo-world (Spectacle)* বা ভৌত-দুনিয়াকে। খ্রীষ্টমাস হোক কি নিউ ইয়ার বা দুর্গাপুজো হোক কি সরস্বতী পুজো তথাকথিত দু'জন *ভালোবাসার* মানুষ (আদতে ভালোবাসা আছে কি নেই বা কম আছে কি বেশি আছে সেটার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে), তারা বিবাহিত হোন কি প্রেমিক প্রেমিকা, ভীষণ *আইডিয়াল কাপল* এর নাটকীয় মোড়কে ছবি পোস্ট করে থাকেন। অন্য দিকে কেউ বন্ধুর সঙ্গে শপিং মলে যাচ্ছেন কি পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে, কিছু অদ্ভুত সিনেম্যাটিক ছবি তাঁর সোশ্যাল নেটওয়ার্কইন সাইট এ সঙ্গে সঙ্গেই পোস্ট করে থাকেন। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে তাতে আপনার কি? আপনিও দিন না! কে বারন করেছে? না, সত্যি এতে হয়ত ব্যক্তি-*আমার* কিছুই না, আবার একজন অন্থ্রোপলজির ভক্ত হবার দরুন আমার অনেক কিছুই। আসলে সমস্যাটা নতুন প্রজন্মের মানসিক চাপের, যেটা বরং বার সোশ্যাল নেটওয়ার্কইন সাইট ভিসিট করার জন্য তৈরি হচ্ছে তাদের মনে। এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই ভাবা উচিত আমাদের। না পাওয়ার উদ্বেগ হতাশা তৈরি করছে এই তরুণ মনের গহীনে।

আচ্ছা একটু ভেবে দেখলে কেমন হয় যে আমরা যেভাবে প্রতিদিন চলাফেরা করি, বাড়িতে যে ধরনের পোশাক পড়ি রোজকার দিনে, প্রতিদিন যেভাবে খাওয়া দাওয়া করি, যেভাবে থাকি, সত্যি কি ঠিক সেই ভাবেই ক্যামেরা বন্দি করি মুহূর্ত গুলোকে? যদি কেউ দাবি করেন হ্যাঁ ঠিক সেই সেই ভাবেই সবটা ক্যামেরা বন্দী হয় তাহলে তিনি ভাগ্যবান। আমি নিজেকে দিয়ে বলতে পারি ছবি তোলার আগে একটু মাথার চুল টা ঠিক করেনি, আলুথালু পোশাকটা পরিপাটি করেনি, যতটুকু ক্যামেরার নাগালে আসছে সেই এলোমেলো জায়গাটা একটু গুছিয়েনি, এবং সেটা সাব-কনশাসলি করে ফেলি কারণ আমার মাথার কোনো অংশে এটা সুপ্ত ভাবে চলতে থাকে আমাকে জনসমক্ষে মানানসই লাগতে হবে। তাই আমার *সত্যামি* ঠিক যেটা, সেটা আসলে ঐ ক্যামেরায় ধরা পড়েনি কারণ সেটা জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। আবার এই মানানসই হতে গিয়ে কোথাও অঘোষিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায় অজান্তেই। ঠিক সেই ভাবেই এখন যারা কিশোর বা সদ্য প্রাপ্ত বয়স্কের ছাড়পত্রটা গ্রহণ করেছে তাদের কাছে এই *spectacle world* টা ভীষণ রঙিন। তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে এই আড়ম্বর পূর্ণ মেকি বাস্তব যা তারা নেটওয়ার্কিং সাইট গুলোয় দেখে। কারণ এখনো তারা জজমেন্টাল হতে শেখেনি এই বিষয়ে। ফল স্বরূপ তাদের জীবন হয়ে উঠছে ভুলে ভরা। *Fear of Missing Out (FoMO)* তাদের ভুল পথে এগিয়ে দিচ্ছে। যেগুলো কোনো একজন নিজের জীবনে মিসিং মনে করছে সেটাই তার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে আর কিভাবে সেটাকে জীবনে সামিল করা যায় সেই নিয়ে চিন্তা করতে থাকছে সবকিছু ভুলে গিয়ে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি বা বাঙালির সরস্বতী পুজো এই দিন দুটো মোটামুটি ২০০০ সালের পর থেকে প্রায় এক রকম হয়ে গেছে কিছু বিশেষ দিক দিয়ে। পুজো টুকু বাদ দিলে দুটোই এখন প্রেমের দিবস বা ভ্যালেনটাইন ডে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। এতে কোনো অসুবিধা নেই কারোর কিন্তু অসুবিধা ঠিক সেই জায়গায় তৈরি হচ্ছে যখন এই কিশোর কিশোরী বা তরুণ তরুণীরা *আমি পিছিয়ে যাচ্ছি অন্যদের থেকে* এটা ভেবে নিজেদের উদ্বেগ ধরে রাখতে পারছেনা আর এই সব অনুষ্ঠান এ নিজেদের *সো কলড* পার্টনার এর সঙ্গে সোসাল নেটওয়ার্কইন সাইট এ ছবি শেয়ার করার জন্য ভালোবাসাহীন সম্পর্কে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলছে। এতে জীবনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে তারা। সেটা তাদের নিজেদের হতে পারে বা পার্টনার এর। এরা দিনের বেশির ভাগ সময় মোবাইল ফোন এ কাটায় এবং ভাবতে থাকে *আমি* কি কি দেখলাম অন্যদের প্রোফাইল এ। এটা ভাবতে পারেনা কোন কোন অংশ নেই ওই প্রোফাইলের মিডিয়া অ্যালবাম এ।

কারণ সেই মানুষটির প্রতিদিনের স্ট্রাগল সেই অ্যালবামে তিনি রাখেন না। আবার একটু অন্য দিকে ভাবলে, যারা সমলিঙ্গ প্রেমে আছে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেও উদ্বেগ তৈরি করছে পার্টনার কে সোসাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে না আনতে পরার, তার সাথে সমলিঙ্গ পার্টনার এর স্বীকারোক্তি দিয়ে ক্যামেরা বন্দী ভালোবাসার মুহূর্ত কে অন্য হেটেরোনর্ম্যাটিভ কাপালদের মত সোশাল নেটওয়ার্কইন সাইট এ প্রকাশ না করতে পারার। কারণ সমাজের চোখে তাদের আবেগ অবৈধ। তাই এখানেও এক ধরনের উদ্বেগ কিছু মিশিঙ্গ আউট এর।

আমরা প্রত্যেকেই যদি এই বিষয়গুলোতে একটু যত্নবান হই তাহলে এই নতুন প্রজন্ম কে আমরা মানসিক চাপের হাত থেকে একটু হলেও রিলিফ দিতে পারি। যদি তাদের বোঝাতে পারি সোসিয়াল মিডিয়ার ঝুটো দেখনদারী আসলে একটা অসুস্থ সমাজের প্রতিচ্ছবি মাত্র। যা আসলেই স্কেপটিকাল। তাদের বোঝাতে হবে বাস্তব পরিস্থিতির দিক গুলো, যে গুলো আসলেই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেয়না কেউ। তাদের বোঝাতে হবে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে নিয়ে নেটওয়ার্কিং সাইট ভিসিট করতে হবে এবং নিজে যাতে সেই ট্রিগার গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারে যেগুলো তার *FoMO* এর জন্ম দিচ্ছে অন্যদের প্রোফাইল দেখার জন্য এবং সেগুলোকে মিনিমাইজ করতে হবে নিজেকে বুঝিয়ে। তাহলেই একটা সুস্থ সমাজ তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য তৈরি করতে পারবে।

ছবি–উদয় প্রামাণিক, ছাত্র, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

ফিরে কি পাওয়া যায়?

সঞ্জীব দাস, ছাত্র, ভূগোল বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীকে নিয়ে চলতে হয়। এই সঙ্গীর হাত ধরতে গিয়ে যদি কোনোরকম ভুল করি, তবে ঘটে যেতে পারে মহা বিপদ। না না সঙ্গীটা কোনো রক্তে-মাংসে গড়া নয়। এ এক এমন সঙ্গী যে একটা মুহূর্তো স্থির থাকতে পারে না। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। এবার হয়তো আপনাদের মনে প্রচুর প্রশ্ন জাগছে তাই না? বলবো বলবো সব বলবো। কিন্তু তার আগে চলুন তো দেখি, একটা সাধারন ঘটনার সাথে পরিচয় হয়ে আসি।

শীতের থমথমে সন্ধ্যা। বাড়িতে বসে রুপম প্র্যাকটিক্যাল করছে। বাইরে থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে আওয়াজ এল-

- বৌদি, ও বৌদি, বাড়িতে আছো নাকি?

রূপমের মা বাড়িতে রুটি করছিল। ডাক শুনতে পেয়ে রুপমের মা দরজা খুলতে এলো।

- আরে পল্টু দা যে! এসো এসো ভেতরে এসো।

পল্টু দা গুটি গুটি পায়ে ভেতরে সোফায় এসে বসলো।

- রূপমকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না। ও কি বাড়িতে নেই নাকি?

- না না কোথায় আর যাবে। ওই যে পাশের ঘরে বসে প্র্যাকটিক্যাল করছে। সারাদিন ওই নিয়েই পড়ে আছে।

- হা হা হা। পল্টু দা হেসে উঠলো।

শব্দ শুনতে পেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ছেড়ে দিয়ে এসে রূপম দেখল তার পল্টু কাকু এসেছে।

- আরে কাকু! কখন এলে?

- এই তো এক্ষুনি।

পল্টুদা এখন বাড়িতে প্রায় থাকে না বললেই চলে। কিছু কাজের জন্য প্রায়শই কলকাতায় যেতে হয়। আজ একটু কাজ থেকে নিস্তার পাওয়ায় এসেছে রূপমের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেবে বলে।

- তোমরা তাহলে গল্প কর। আমি চা নিয়ে আসছি।

এই বলে রুপমের মা রান্না ঘরে চলে গেল।

- তা বলছি, তোর পড়াশোনা কেমন চলছে?

রুপম বলল- আর বোলো না কাকু, কটা দিন পরেই আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা। সঙ্গে এতগুলো প্র্যাকটিক্যাল। কার ভালো লাগে বলো তো।

পল্টু দা হাসতে লাগলো।

- কি ব্যাপার কাকু তুমি হাসছো কেন?

- আর কি করবো বল, তোর কথাগুলো শুনে তো আমার হাসি পাচ্ছে। তো এগুলো এখন করবি না তো কখন করবি? আমিও যখন তোর মতো ছাত্র ছিলাম তখন তো এইভাবেই প্র্যাকটিক্যাল ,এক্সাম, ঘোরাঘুরি, ফাঁকি মারা, আরো কত কি করেই তো আমাদের কেটে গেল।

রুপম এইসব শুনে বলল- ওটাই তো বলছি। সারাদিন পড়া আর পড়া। দূর ছাই ভালো লাগে না আর। মন চাইছে এক্ষুনি যেন বড়ো হয়ে যাই। তাহলে তোমার মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াবো, কাজকর্ম করবো, কেউ তখন আর বলবে না যে, এখানে আসবি না -ওখানে যাবি না, ওটা করবি না, এটা করবি না। পুরোটাই তখন নিজের সিদ্ধান্ত। কি মজাই না হবে। কোনো পড়া থাকবে না, পড়তে হবে না, শুধু মজা আর মজা।

এই সময় রূপমের মা চা আর রুটি তরকারি নিয়ে এলো।

- তোমরা তাহলে গল্প করো আমি ওপাশটা গিয়ে দেখি কতটা কি রান্না হলো।

- বেশ বৌদি।

পল্টু দা চায়ের কাপে এক চুমুক চা খাওয়ার পর এক দীর্ঘশ্বাস নিল।

- কি হলো পল্টু দা চা ভালো হয়নি?

- না রে, চা খুব সুন্দর হয়েছে।

- তাহলে কি হলো হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে যে?

- আসলে তুই এক্ষুনি বললি না যে, বড়ো হয়ে গেলে কোনো সমস্যা থাকে না। আনন্দে ঘোরা যায়। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। আর তোর ভাবনাটাও এই বয়সে যে খুব খারাপ সেটাও নয়। এটা এই বয়সেই ভাবা স্বাভাবিক। আমিও যখন তোর মতো ছোটো ছিলাম, ঠিক এই কথাগুলো আমিও মনে মনে ভাবতাম। আর ঠাকুরের কাছে বলতাম- হে ভগবান, আমিও যেন তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাই, তাহলে কেউ আর মারবে না, বকবে না। নিজের মতো করে জীবনটাকে তখন আনন্দের সঙ্গে কাটাবো। কিন্তু এখন ভাবি যে- ছোটবেলাটাই ভালো ছিল। হ্যাঁ রোজ রোজ হয়তো মায়ের বকা খেতাম, আবার কখনো কখনো হয়তো বেতের আঘাতও পড়েছে পিঠে। সেগুলো এক আলাদাই অনুভুতি ছিল। কিন্তু ছোটবেলায় কাটিয়ে আসা মজা গুলো তুই আজ আমার মতো বড়ো অবস্থায় এসে চাইলেও ফিরে পাবি না।

ছোটবেলায় কোনো চাপ নেই তা আমি বলবো না। কিন্তু ছোটবেলায় যে চাপগুলো ছিল, বড়ো হওয়ার পর সেই চাপ গুলো এখন খুবই ক্ষুদ্রতম। তাই এখন যে সময়টা কাটছে সেটা আনন্দের সাথে কাটা।

- রূপম মাথা নাড়ালো।

- বৌদি আসছি তাহলে প্রায় অনেকক্ষণ হলো।

রান্নাঘর থেকে রূপমের মা বেরিয়ে এলো এবং বলল- থাকলে হতো না আমি রান্না করতাম তো?

- আজ থাক বৌদি । অন্য কোনো একদিন না হয় আসবো। কাল সকালেই আবার বেরোতে হবে আমাকে। সময় তো হয়ে ওঠে না সবসময় একসাথে পরিবারের সাথে সময় কাটানোর, তাই যাই একটু পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাই। রূপম ভালো করে পড়াশুনা করে যা, আসছি তাহলে।

- হ্যাঁ পল্টু কাকু সাবধানে বাড়ি যেও।

আস্তে আস্তে পল্টু দার জুতোর আওয়াজ কমতে থাকলো।

আসলে আমরা ছোটবেলায় ভাবি যে, কবে বড়ো হবো। আবার বড়ো হয়ে গেলেই ভাবি যে আমরা কি আর ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারি না!

তাই প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের জীবনের প্রতিটা ধাপে এক সঙ্গীকে গুরুত্ব দিতে হয় সেটা আর কেউ নয় সেটা হলো *সময়*। তাই ছোটবেলার সময়টাকে তখনই গুরুত্ব দাও যখন সেটা দেওয়ার সময়। কারণ সময় একবার পেরিয়ে গেলে আমরা চাইলেও পেছনে ফেলে আসা সময়কে গুরুত্ব দিতে পারব না। আসলে আমরা সেইসময় গুলোকেই বেশি করে চাই যেগুলো চলে গেছে।

অর্থাৎ সবমিলিয়ে এখন একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করছে যে, বর্তমান সময় চলছে এই সময়টাকে ভালোবেসে গুরুত্ব দাও কারণ এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে তখন হয়তো এটার জন্যই তোমার মন কেমন করবে। তাই এই মুহূর্তের সময়টাকে গুরুত্ব দাও। ভালোবাসো সেই সময়টাকে।

ছবি-- বিনীতা মাল, ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

উড়ো চিঠি

রিতু সামন্ত, ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

যেমন করে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে ওরা

সহস্র যুগ পরেও নাকি আকাশ হতে ঝরে পড়ে তারা।

ঝিকিমিকি -মিটিমিটি কত স্বপ্ন ভরা চোখে

মায়ের কোলে ছোট্ট শিশু খেলে যেমন করে।

অশ্রু ভরা মায়ের নয়ন, মুখে বেদনাদায়ক হাসি!

একবার যদি আসতো হেথা, পড়তাম তব উড়ো চিঠি।

দিন যায়, বছর ফুরায়... সূর্য-ও অস্তগামী

দিনশেষে একবার যদি পেতাম তব চরণধুলি।

সন্তান মোর বড্ড শিশু, আমি অভাগীনি...

অবিচল নয়নে প্রহর গুনি কবে ফিরবে ওগো তুমি।

যদুর মা শুধায় মোরে... তোর কীসের দুঃখ লো? মুখপুড়ি

সম্পত্তি তব অঢেল আছে, মোদের মত ভাজুনি তো আর

মুড়ি।

ধরি, মরি, পায়ে পড়ি চুপ করো সবাই এখনি

সম্পত্তি নয় বিশ্বাস চাই, পারবে কী কেউ এনে দিতে সেই

চিঠি?

মা হারা কন্যা আমি... নিজেই এখন মা

পতিসুখে, পাতিতালয়ে জন্মিল এক কন্যা।

পূর্বজীবনে পতিতা হলেও, পর জীবনে পবিত্র অর্ধাঙ্গিনী

অর্ধ অঙ্গের সঙ্গিনী তব, ক্রন্দনরতা কল্যাণী।

সামরিক বাহিনীর লড়াই শেষে শুধু একবার বাড়ি ফিরে

এসো তুমি।

ছবি—উদয় প্রামাণিক, ছাত্র, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়